Equality) ; [২] স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom) ; [৩] শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (Right against Exploitation) ; [৪] ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom of Religion) [৫] সংস্কৃতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (Cultural and Educational Right) এবং [৬] সাংবিধানিক প্রতিবিধানের অধিকার (Right to Constitutional Remedies)। কিন্তু মূল সংবিধানে সম্পত্তির অধিকার অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় তখন এরূপ অধিকারের সংখ্যা ছিল ৭। ১৯৭৮ সালে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে সম্পত্তির অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অংশ থেকে বাদ দেওয়া হয়।

*ছ'প্রকার মৌলিক অধিকার*

## ● [১] সাম্যের অধিকার (Right to Equality)

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা—এই তিনটি রাজনৈতিক আদর্শ যুগ যুগ ধরে মানুষকে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ১৭৭৬ সালে 'আমেরিকার স্বাধীনতা-সংক্রান্ত ঘোষণা'য় বলা হয়, সব মানুষকেই সমানভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে (All men are created equal)। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের জাতীয় সংসদ ঘোষণা করেছিল, প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকেই সমানভাবে অধিকার ভোগ করতে পারবে। এইভাবে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সময় উদীয়মান পুঁজিপতিশ্রেণী সাম্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করে জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতিলাভের চেষ্টা করেছিল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 'মানবাধিকার সম্পর্কিত ঘোষণা' (Universal Declaration of Human Rights, 1948)-র ১ নং ধারা অনুযায়ী, সব মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন এবং মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকলেই সমান। ৭ নং ধারায় বলা হয়েছে, আইনের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই সমান। কোনরকম ভেদবিচার না করে আইন সকলকেই সমানভাবে রক্ষা করবে। এইভাবে সাম্য ও স্বাধীনতা একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত বলে মনে করা হয়। স্বাধীনতার ধারণাকে কার্যকর করতে হলে সাম্যের প্রয়োগ একান্তভাবেই অপরিহার্য। ল্যাস্কি (Harold Laski)-র মতে, সমাজের মধ্যে যদি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা বর্তমান থাকে, তাহলে জনগণের কোনরকম স্বাধীনতা থাকতে পারে না। ধনবৈষম্যমূলক সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না থাকায় রাজনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আইনগত স্বাধীনতার কোন মূল্য থাকে না। এরূপ সমাজে আইন প্রভুত্বকারীশ্রেণীর স্বার্থে প্রণীত হয় বলে তা কখনই সাম্যের নীতিকে যথাযথভাবে কার্যকর করতে পারে না।

*সাম্যের অধিকার হোল একটি মৌলিক অধিকার*

ভারতীয় সংবিধানের ১৪-১৮ নং ধারাগুলিতে সাম্যের অধিকার ঘোষিত ও স্বীকৃত হয়েছে। ১৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, ভারতের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' (equality before the law) কিংবা 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' (equal protection of laws) হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। ১৪ নং ধারাটি সংবিধানে সন্নিবেশ করতে গিয়ে সংবিধানের প্রণেতাগণ যুগপৎ যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' কথাগুলি যুক্তরাজ্যের সাধারণ আইন (Common Laws) থেকে এবং 'আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার

*'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' হওয়ার অধিকার*

Scanned with CamScanner

অধিকার মার্কিন সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী আইনের ১ নং ধারা (Section I) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই ধারায় বলা হয়েছে, নিজের এক্তিয়ারের মধ্যে (within its jurisdiction) রাষ্ট্র কোনও ব্যক্তিকে আইনসমূহ কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে না। এই দু'টি অধিকারের মধ্যে কোনও পার্থক্য আছে কিনা, সে বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বিচারপতি সুব্বা রাও বলেছিলেন, 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' হোল 'একটি নেতিবাচক ধারণা' (a negative concept) এবং 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার' অধিকার হোল 'একটি ইতিবাচক ধারণা' (a positive one) (উত্তরপ্রদেশ রাজ্য বনাম দেওমন, ১৯৬০)। প্রথমটির অর্থ—আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান অর্থাৎ কেউ-ই বিশেষ কোন সুযোগ-সুবিধা (special privileges) দাবি করতে পারে না এবং সব শ্রেণীর নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা সমভাবে সংরক্ষিত হবে। দ্বিতীয়টির অর্থ হোল—সমান অবস্থায় সমপর্যায়ভুক্ত সব ব্যক্তির প্রতি আইন সমান আচরণ করবে এবং সকলকে সমানভাবে রক্ষা করবে। প্রখ্যাত সংবিধান-বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসুও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

*আইনের দৃষ্টিতে সমতার অর্থ ও তার ব্যতিক্রম*

ডাইসির 'আইনের অনুশাসন' (Rule of Law) তত্ত্বের দ্বিতীয় নীতি হোল আইনের দৃষ্টিতে সমতা। এর অর্থ—কোন ব্যক্তিই দেশের আইনের উর্ধ্বে নয়। ক্ষমতা, পদমর্যাদা ও অবস্থা নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি সাধারণ আইনের অধীন এবং সাধারণ আদালতের নিকট একই রকম বে-আইনী কাজের জন্য সকলকেই সমানভাবে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। এ বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ একজন কৃষকের কোনও পার্থক্য নেই।

আইনের দৃষ্টিতে সমতার অর্থ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আইভর জেনিংস মন্তব্য করেছেন যে, আইনের দৃষ্টিতে সমতা বলতে বোঝায় "সমকক্ষদের মধ্যে আইন সমান ও সমভাবে প্রযোজ্য হবে" (among equals the law should be equal and should be equally administered) এবং একই ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে আইন অভিন্ন আচরণ করবে (like should be treated alike)। 'একই ধরনের কাজের জন্য' (for the same kind of action) সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক (all citizens of full age) জাতি, ধর্ম, সম্পদ (wealth), সামাজিক মর্যাদা কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি নির্বিশেষে আদালতে অভিযোগ করতে বা অভিযুক্ত হতে পারবে। রুবিন্দর সিং বনাম ভারত ইউনিয়ন (১৯৮৩) মামলায় সুপ্রীম কোর্ট প্রদত্ত রায় অনুযায়ী, আইনের অনুশাসন এই দাবি করে যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার চরম প্রয়োজনীয়তার সময়েও কোন ব্যক্তির সঙ্গে 'কঠোর, বর্বর কিংবা বৈষম্যমূলক আচরণ' (harsh, uncivilised or discriminatory treatment) করা চলবে না।

কিন্তু ভারতে 'আইনের দৃষ্টিতে সমতা' নীতির কতকগুলি ব্যতিক্রম (exception) বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ব্যতিক্রমগুলি হোল ঃ

[i] রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ পদাধিকারবলে যেসব ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কর্তব্য সম্পাদন করেন কিংবা ক্ষমতার প্রয়োগ ও কর্তব্য সম্পাদন করতে গিয়ে যেসব কার্য করেন, সেজন্য তাঁদের কোনও আদালতের নিকট কৈফিয়ত দিতে হয় না।

[ii] রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালগণ যতদিন স্ব-পদে বহাল থাকেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায় না।

[iii] স্বপদে বহাল থাকাকালীন এঁদের গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোনও আদালত নির্দেশ

Scanned with CamScanner

[iv] এমনকি, স্বপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে সম্পাদিত ব্যক্তিগত কার্যাবলীর জন্য রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালগণের বিরুদ্ধে দেওয়ানী মামলা দায়ের করার জন্য ২ মাসের নোটিস দিতে হয়।

উপরি-উক্ত সাংবিধানিক ব্যতিক্রম ছাড়াও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে 'আইনের দৃষ্টিতে সাম্য' নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। এগুলি হোল ঃ

[v] বিদেশী রাষ্ট্রের শাসকগণ এবং রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হয় না। কারণ, এঁরা ভারতীয় আদালতের এক্তিয়ারভুক্ত নন।

[vi] যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রুপক্ষের ব্যক্তিরা ভারতীয় আদালতে মামলা রুজু করতে পারে না এবং অন্যান্য বন্দীদের মতো সুযোগ-সুবিধাও দাবি করতে পারে না।

[vii] পার্লামেন্ট এবং রাজ্য-আইনসভার সদস্যরা বেশ কয়েকটি 'বিশেষাধিকার' (privileges) ভোগ করেন।

[viiii] ফ্রান্সের সরকারী কর্মচারী বা শাসনকার্যে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের বিরোধ বাধলে সেই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য স্বতন্ত্র 'প্রশাসনিক আইন' (Administrative Law) এবং স্বতন্ত্র 'প্রশাসনিক আদালত' (Administrative Tribunal) রয়েছে। ভারতেও ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছে যে, পার্লামেন্ট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এরূপ আদালত গঠন করতে পারে। যে-কোন সরকারী কর্মচারী, স্থানীয় সংস্থা বা সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীবৃন্দের চাকরি-সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধ নিষ্পত্তির দায়িত্ব ট্রাইব্যুনালের হাতে অর্পণ করা হয়। তাছাড়া, শিল্প, ভূমি-সংস্কার, খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন প্রভৃতি-সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যও সংশ্লিষ্ট আইনসভা আইনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে পারে।

১৪ নং ধারার দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়া' বলতে বোঝায় সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আইন সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। অন্যভাবে বলা যায়, একই রকম অবস্থায় সকলে আইন কর্তৃক সমানভাবে সংরক্ষিত হবে এবং আইন কর্তৃক আরোপিত বাধ্যবাধকতা সমানভাবে মেনে চলবে। এর অর্থ এই নয় যে, অবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ না করে প্রতিটি আইন সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। যুক্তিসঙ্গতভাবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে এবং প্রতিটি পৃথক ক্ষেত্রে আইন পৃথকভাবে প্রযুক্ত হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যাঁরাই আয় করেন, তাঁদের সবাইকে আয়কর প্রদান করতে হয় না। আয়ের পরিমাণের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে ভিন্ন ভিন্ন হারে আয়কর প্রদান করতে হয়। অবশ্য এই শ্রেণী-বিভাজনের ভিত্তি যথার্থ ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যে-উদ্দেশ্যে আইন প্রণীত হয়েছে, সেই উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবে আইনসভা বিভিন্ন ব্যক্তির শ্রেণী-বিভাজন করে আইন প্রণয়ন করলেও তা 'আইন কর্তৃক সমভাবে সংরক্ষিত হওয়ার' অধিকারকে খর্ব করে না। বোম্বাই রাজ্য বনাম এফ. এন. বালসারা (১৯৫১) মামলার রায়ে বিচারপতি ফজল আলি মন্তব্য করেছিলেন যে, এই নীতিটি রাষ্ট্রের হাত থেকে 'যুক্তিসঙ্গত উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শ্রেণী-বিভাজনের ক্ষমতা' (the power of classifying persons for legitimate purpose) কেড়ে নেয়নি। অনুরূপভাবে, রামকৃষ্ণ ডালমিয়া বনাম তেন্ডুলকর (১৯৫৯) মামলায় বিচারপতি গজেন্দ্রগাদকার এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, ১৪ নং ধারা 'শ্রেণীগত আইন প্রণয়ন' (class legislation) নিষিদ্ধ করলেও 'যুক্তিসঙ্গত শ্রেণী-বিভাজনের জন্য আইন প্রণয়ন' নিষিদ্ধ করেনি।

*আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত হওয়ার অর্থ*

Scanned with CamScanner

'শ্রেণীগত আইন প্রণয়ন' বলতে সমাজের বহুসংখ্যক মানুষের মধ্যে 'এক শ্রেণীর মানুষ' (a class of persons)-কে খেয়াল-খুশি মতো বেছে নিয়ে অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলকভাবে বিশেষ কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা তাদের প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করাকে বোঝায় (মনোপোনিয়ার বনাম সিটি অব্ লস্ এঞ্জেলস্)। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কোন আইন যদি সমপর্যায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, সেক্ষেত্রে আদালত সেই আইন বাতিল করে দিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ ১৯৫২ সালে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বনাম আনোয়ার আলী সরকার মামলায় সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মামলায় সুপ্রীম কোর্ট 'পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ আদালত আইন, ১৯৫০' (West Bengal Special Courts Act, 1950)-এর ৫(১) ধারাটি বাতিল করে দেন। কারণ, এই ধারাবলে সমান অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা সম্ভব ছিল। বলা বাহুল্য, শ্রেণী-বিভাজন 'যুক্তিসঙ্গত' কিনা, তা একমাত্র আদালতই বিচার করার অধিকারী। এরূপ শ্রেণী-বিভাজনের দু'টি পূর্ব-শর্ত রয়েছে বলে সি. আই. এমডেন বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য (১৯৬০) মামলায় বিচারপতি এস. আর. দাশ মন্তব্য করেছিলেন। এগুলি হোল—(১) শ্রেণী-বিভাজনের নীতি সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হবে এবং (২) শ্রেণী-বিভাজনের সঙ্গে আইনের উদ্দেশ্যের যুক্তিসঙ্গত সম্পর্ক বর্তমান থাকবে।

আইনসভার 'যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাজনে'র ভিত্তি কী, তা আলোচনা করতে গেলে আমাদের বিভিন্ন সময়ে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায়ের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। 'যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাজনে'র ভিত্তি হিসেবে যে সব বিষয়কে গ্রহণ করা যেতে পারে, সেগুলি হোল :

[i] অনেক ক্ষেত্রে সময়ের ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিভাজন করা হয় (ধীরেন্দ্র বনাম লিগ্যাল রিমেম্ব্রান্সার, ১৯৫৫)। আইনসভা কোনও কর-হার (tax-rate)-এর পুনর্বিন্যাস করার সময় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে যে, নতুন কর-হার কার্যকর হওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট করের পুরাতন বছরের বাকী হিসেব-নিকেশ পুরাতন হারে সম্পাদন করা হবে।

[ii] অনেক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক ভিত্তি (territorial or geographical basis)-তে আইনসভা এরূপ বিভাজন করতে পারে (পুরুষোত্তম বনাম দেশাই, ১৯৫৬)। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, দেশের কয়েকটি মাত্র জেলার জন্য আইনসভা জরুরী বিচার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করতে পারে।

[iii] কোনও দ্রব্যের প্রয়োজনের ভিত্তিতে আইনসভা এক শ্রেণীর ব্যক্তির সঙ্গে অন্য শ্রেণীর ব্যক্তির পার্থক্য নির্দেশ করে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী (নারায়ণ লাল বনাম মানেক, ১৯৬১ ; বোম্বাই রাজ্য বনাম বালসারা, ১৯৫১)। এইভাবে আইনসভা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অসামরিক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মাদক দ্রব্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করলেও সামরিক ব্যক্তিদের জন্য তা নিষিদ্ধ নাও করতে পারে।

[iv] বাণিজ্য (trade), ব্যবসায় (business), বৃত্তি (profession) ইত্যাদির প্রকৃতির ভিত্তিতেও আইনসভা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে শ্রেণীবিভাজন করে আইন প্রণয়ন করতে পারে (হাথি সিং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী বনাম ভারত ইউনিয়ন, ১৯৬০)।

[v] আবার, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণীত হতে পারে (মোতি দাস বনাম শাহী, ১৯৫৯)। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক বিবাহ আইন রয়েছে।

অনেকে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, সংবিধানের ১৪ নং ধারাটি বিশেষ শ্রেণীর জন্য আইন প্রণয়ন (class legislation) নিষিদ্ধ করলেও যুক্তিসঙ্গত শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ করেনি। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই ধারাটি কার্যবিধি-সংক্রান্ত (proce-

Scanned with CamScanner

dural) এবং কার্যবিধি-সংক্রান্ত নয় এরূপ গুরুত্বপূর্ণ (substantive) আইনের বৈষম্যমূলক আচরণের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করে। 'আইন কর্তৃক সমভাবে রক্ষিত' হওয়া বলতে কেবল বৈষম্যমূলক আইনের হাত থেকে সংরক্ষণ করাকেই বোঝায় না, আইনের বৈষম্যমূলক প্রয়োগের হাত থেকেও সংরক্ষণকে বোঝায়। কোন আইন কিংবা তার প্রয়োগ বৈষম্যমূলক কিনা তা বিচার করার দায়িত্ব আদালতের হাতে ন্যস্ত হয়েছে। এইভাবে সংবিধানের ১৪ নং ধারাটি ভারতে বিচারালয়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে বলে কে. ভি. রাও প্রমুখ অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ২৫-তম সংবিধান সংশোধনী আইন (১৯৭১) প্রণয়নের মাধ্যমে ৩১ নং ধারার সঙ্গে ৩-গ নং উপধারা সংযোজিত হয়। এই উপধারায় বলা হয় যে, সংবিধানের ৩৯ (খ) ও (গ) নং উপধারা দু'টিতে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে পার্লামেন্ট কোন আইন প্রণয়ন করলে তা সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩১ নং ধারার বিরোধী বলে বাতিল হবে না এবং এ নিয়ে আদালতে কোনরূপ প্রশ্নও তোলা যাবে না। অবশ্য ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় সুপ্রীম কোর্ট শেষোক্ত অংশটি বাতিল করে দেন। ফলে সংবিধানের ১৪, ১৯ ও ৩১ নং ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকারগুলির ওপর ৩৯ (খ) ও (গ)-তে বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিটির প্রাধান্য পূর্বের মতোই থেকে যায়। এর পর ১৯৭৬ সালে প্রণীত ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়, যে-কোন একটি বা সবগুলি নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে পার্লামেন্ট কোন আইন প্রণয়ন করলে আদালত তার বৈধতা বিচার করতে পারবেন না। কিন্তু মিনার্ভা মিলস্ মামলায় (১৯৮০) সুপ্রীম কোর্ট ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের এই অংশটি বাতিল করে দিলেও বর্তমানে ১৪ ও ১৯ নং ধারার ওপর ৩৯ (খ) ও (গ) উপধারার প্রাধান্য পূর্বের মতোই বিদ্যমান। সেদিক থেকে বিচার করে বলা যেতে পারে যে, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ১৪ নং ধারায় বর্ণিত সাম্যের অধিকারের গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে।

*সাম্যের অধিকারের প্রকৃত স্বরূপ*

কিন্তু সাম্যের অধিকার তত্ত্বগতভাবে স্বীকৃত হলেও বাস্তবে তা ভারতীয় জনগণের কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়ছে। কারণ, ধনী ব্যক্তিদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দরিদ্র জনসাধারণকে আদালতের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু মামলা চালাবার মতো ব্যয়ভার বহন করার ক্ষমতা তাদের নেই। ফলে ধনশালী ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলায় অনেক সময় নির্দোষ দরিদ্র ব্যক্তিকে পরাজিত হতে হয়। যুক্তরাজ্যের মতো ভারতে দরিদ্র ব্যক্তিদের আইনগত সাহায্যদানের তেমন কোন ব্যবস্থা অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি। অবশ্য ১৯৭৬ সালে ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সংবিধানের চতুর্থ অংশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু চতুর্থ অংশে বর্ণিত বিষয়গুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হওয়ায় এগুলির কোন কার্যকরী মূল্য নেই বলে মনে করা হয়। এগুলিকে সংবিধান-প্রণেতাদের সদিচ্ছার প্রকাশ বলেই ধরে নেওয়া হয়।

*সাম্যের অধিকারের অবাস্তবতা*

সংবিধানের ১৫ নং ধারায় নাগরিকদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে বলা হয়েছে যে, ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করবে না। আবার, উপরি-উক্ত কারণগুলির জন্য সর্বসাধারণের ব্যবহার্য দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ ও প্রমোদস্থানে প্রবেশ এবং সরকারী অর্থে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত কিংবা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত কূপ, জলাশয়, স্নানাগার, পথ ও জনসমাগমের স্থান ব্যবহারের অধিকার থেকে কোন নাগরিককে বঞ্চিত করা যাবে না [১৫(২) নং ধারা]।

*ধর্ম, জাতি, বর্ণ ইত্যাদি নির্বিশেষে সকলের সমানাধিকার*

Scanned with CamScanner

অবশ্য জনস্বার্থে রাষ্ট্র কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ আরোপ করতে পারে, যেমন—জনস্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশে পূর্ব-বর্ণিত স্থানগুলিতে কোনও ছোঁয়াচে রোগীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করে সরকার আইন প্রণয়ন করতে পারে। তাছাড়া, আরও দু'টি ক্ষেত্রে এই সাম্যনীতির ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। *প্রথমতঃ,* স্ত্রীলোক ও শিশুদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে [১৫(৩) নং ধারা]। *দ্বিতীয়তঃ,* সামাজিক এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরশ্রেণী এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতির নাগরিকদের উন্নতির জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম [১৫(৪) নং ধারা]। এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ সাম্যনীতির বিরোধী বলে বিবেচিত হয় না।

*বাধা-নিষেধসমূহ*

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বাধীনতালাভের কয়েক বছর পর মাদ্রাজের (বর্তমান তামিলনাড়ু) সরকারী কলেজগুলিতে ভর্তি হওয়ার জন্য তদানীন্তন মাদ্রাজ সরকার কিছুসংখ্যক আসন নিম্নবর্ণের হিন্দু এবং অহিন্দুদের জন্য সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়ে একটি সরকারী আদেশ জারি করেন। সরকারের এই আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রীম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। এগুলির মধ্যে মাদ্রাজ রাজ্য বনাম এস. সি. দোরাইরাজন্ (১৯৫১) এবং মাদ্রাজ রাজ্য বনাম সি. আর. শ্রীনিবাস (১৯৫১) মামলা দু'টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দু'টি মামলার রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট মাদ্রাজ সরকারের এই আদেশকে সাম্যনীতির বিরোধী বলে বর্ণনা করে বাতিল করে দেন। এরপর প্রথম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ১৫ নং ধারার সঙ্গে ৪ নং উপধারাটি সংযোজিত হয়। ফলে অনুন্নত এবং তফসিলী জাতি ও উপজাতির নাগরিকদের উন্নতির জন্য বিশেষ সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের পথে বাধা দূরীভূত হয়।

সংবিধানের ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ব্যাপারে সব নাগরিকের সমান সুযোগ-সুবিধা থাকবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ, জন্মস্থান, বাসস্থান, স্ত্রী-পুরুষ অথবা এর যে-কোন একটি কারণের জন্য কোনও নাগরিক সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না কিংবা তার প্রতি কোন বিভেদমূলক আচরণ করা যাবে না [১৬(২) নং ধারা]। সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগ ছাড়াও বেতন, পদোন্নতি, ছুটি, পেনশন প্রভৃতি বিষয়েও এই নিয়ম কার্যকর হবে। এই অধিকার কেবল সাম্প্রদায়িক বৈষম্য (communal discrimination)-এর বিরুদ্ধেই নয়, সেই সঙ্গে স্থানীয় (local) অথবা স্ত্রীলোকদের (weaker sex) ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধেও রক্ষাকবচ (safeguard) হিসেবে কাজ করবে বলে দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন।

*সরকারী চাকরিতে সকলের সমান অধিকার*

তবে এই সমানাধিকারেরও কিছু কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। ব্যতিক্রমগুলি হোল ঃ

[i] পার্লামেন্ট যে-কোন অঙ্গরাজ্য অথবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারী চাকরি বা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বসবাসগত যোগ্যতাকে অন্যতম শর্ত হিসেবে আরোপ করতে পারে [১৬(৩) নং ধারা]। কিন্তু কোন রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নির্দিষ্ট কোন অংশের জন্য বসবাসগত যোগ্যতা স্থির করে দেওয়ার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। নরসিমা রাও বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ মামলায় (১৯৬৯) সুপ্রীম কোর্ট 'অন্ধ্রপ্রদেশ সরকারী চাকরি আইন' (the Andhra Pradesh Public Employment Act)-এর ৩ নং ধারাটিকে সংবিধানের ১৬ নং ধারার বিরোধী বলে ঘোষণা করেন এবং তা বাতিল করে দেন। কারণ, এই ধারায় কেবল তেলেঙ্গানা জেলার জন্যই বসবাসগত যোগ্যতা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল।

*কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম*

Scanned with CamScanner

**[ii]** প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্র অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিকদের জন্য কিছু সরকারী পদ বা চাকরি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে [১৬(৪) নং ধারা]।

**[iii]** কোনও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত চাকরি সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে [১৬(৫) নং ধারা]।

**[iv]** প্রশাসনিক দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সরকার তফসিলী জাতি ও উপজাতিভুক্ত ব্যক্তিদের কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারী চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারেন (৩৩৫ নং ধারা)।

**[v]** উপরি-উক্ত ব্যতিক্রমগুলি ছাড়াও মূল সংবিধানে আর একটি ব্যতিক্রম লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তা হোল—ভারতের নতুন সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বে ইঙ্গ-ভারতীয়দের জন্য কয়েকটি সরকারী পদ সংরক্ষিত রাখার যে-ব্যবস্থা ছিল, তা ১৯৬০ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত বহাল রাখার ব্যবস্থা করা হয় (৩৬৬ নং ধারা)। ১৯৬০ সালের ২৫শে জানুয়ারী থেকে এই বিশেষ সংরক্ষণ-ব্যবস্থা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সংবিধানের ১৬ নং ধারা অনুসারে সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে সমানাধিকার নীতি কার্যকর করা হলেও অন্যান্য নিয়োগকারীর মতো সরকার চাকরি প্রদান কিংবা পদোন্নতির সময় পদপ্রার্থীদের মধ্য থেকে ক্ষমতা, নিয়মশৃঙ্খলা (discipline) ইত্যাদির ভিত্তিতে কয়েকজনকে বেছে নিতে পারে। এর দ্বারা সমানাধিকার নীতি লঙ্ঘিত হয় না বলে মনে করা হয়।

*অস্পৃশ্যতা বর্জন-বিষয়ক ব্যবস্থা*

যুগ যুগ ধরে অস্পৃশ্যতা (untouchability) ভারতীয় সমাজজীবনে দুষ্ট ক্ষতের মতো নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল। স্বাধীন ভারতের সমাজজীবন থেকে একে চিরদিনের জন্য মুছে দেওয়ার উদ্দেশে সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এই ধারায় অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধনের কথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা এবং অস্পৃশ্যতা-আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অর্থাৎ অস্পৃশ্য বলে কোনও ভারতীয়কে তার প্রাপ্য অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হলে কিংবা অসম্মান করলে আইনতঃ শাস্তি পেতে হয়। সংবিধানের এই নির্দেশ কার্যকর করার জন্য ১৯৫৫ সালে 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইন' [Untouchability (offences) Act, 1955] প্রণীত হয়। কিন্তু সংবিধানে বা এই আইনে 'অস্পৃশ্যতা' বলতে কী বোঝায়, তা ব্যাখ্যা করা হয়নি। তবে 'অস্পৃশ্যতা (অপরাধ) আইনে' কয়েকটি কাজকে 'অপরাধ' (offence) বলে বর্ণনা করে সেইসব অপরাধমূলক কাজের জন্য শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আইন অনুসারে 'অস্পৃশ্য' বলে কোনও ব্যক্তির হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কিংবা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কোনও দেবালয় অথবা দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ, প্রমোদস্থান প্রভৃতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা অপরাধ বলে গণ্য হবে। তাছাড়া, সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাস্তাঘাট, জল-কল, জলাধার, শ্মশান, গোরস্থান ইত্যাদি ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও 'অস্পৃশ্য' বলে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

কিন্তু সংবিধান এবং আইন উভয়েই 'অস্পৃশ্যতা' আচরণ নিষিদ্ধ করলেও সমাজজীবন থেকে অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়নি। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত না হলে কেবল আইন প্রণয়ন করে সামাজিক ব্যাধিগুলির নিরসন করা সম্ভব নয়। তাই আজও ভারতের বুকে হরিজন নিগ্রহ বা হত্যার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। অনেকে তাই অস্পৃশ্যতা বর্জন বিষয়ক ধারাটিকে সংবিধানের তৃতীয় অংশে লিপিবদ্ধ না করে চতুর্থ অংশে লিপিবদ্ধ করাই শ্রেয় ছিল বলে মনে করেন।

Scanned with CamScanner

*উপাধি গ্রহণ ও ব্যবহার*

সংবিধানের ১৮(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সামরিক কিংবা শিক্ষাক্ষেত্রে গুণের স্বীকৃতি বিষয়ক উপাধি (title) ছাড়া রাষ্ট্র অন্য কোন উপাধি প্রদান করবে না। কোনও ভারতীয় নাগরিক কোন বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না [১৮(২) নং ধারা]। আবার, ভারত সরকারের কার্যে নিযুক্ত কোন বিদেশী ব্যক্তি ভারতের রাষ্ট্রপতির বিনা অনুমতিতে অন্য কোন রাষ্ট্রের নিকট থেকে উপাধি গ্রহণ করতে পারবে না [১৮(৩) নং ধারা]। এমনকি, রাষ্ট্রীয় কার্যে নিযুক্ত বা লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতির অনুমতি ছাড়া কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের উপহার, বেতন বা পদ গ্রহণ করতে পারবে না [১৮(৪) নং ধারা]।

কিন্তু, ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করার ব্যবস্থা চালু করে। অবশ্য সরকারী মতে, রাজা, মহারাজা, নবাব প্রভৃতির মতো এগুলি উপাধি নয় ; পুরস্কার বা সম্মানমাত্র। তাছাড়া, রাষ্ট্র-প্রদত্ত সম্মানসূচক এইসব পুরস্কার যাঁরা লাভ করেন, তাঁরা নিজেদের নামের পাশে অথবা চিঠির মধ্যে এগুলির কোনও উল্লেখ করতে পারবেন না বলে ১৯৬৮ সালের ১৭ই এপ্রিল একটি সরকারী আদেশ জারি করা হয়। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারত সরকার ঐসব উপাধি প্রদান বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু ১৯৮০ সাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় ঐসব উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করেছে।

*এই নীতির সমালোচনা*

সমালোচকদের মতে, ঐসব উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা সংবিধানের সাম্যনীতির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয়। কারণ, *প্রথমতঃ,* যাঁরা এইসব উপাধি লাভ করেন, তাঁদের সামাজিক পদমর্যাদা সাধারণ নাগরিকদের অপেক্ষা অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যাঁরা 'ভারতরত্ন' উপাধি লাভ করেন, পদমর্যাদার দিক থেকে ঠিক ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের পরেই তাঁদের স্থান। *দ্বিতীয়তঃ,* নিজেদের নামের সঙ্গে এইসব সম্মানসূচক উপাধি ব্যবহার করা যাবে না বলে বলা হলেও সংবিধান কিংবা কোনও আইন এর ব্যবহারকে 'অপরাধ' (offence) বলে কোথাও ঘোষণা করেনি। *তৃতীয়তঃ,* ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রপতি এক আদেশ জারি করে ঘোষণা করেন যে, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলি ভারতের কাছে বিদেশী রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হবে না। এর ফলে কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে সম্মান-সূচক উপাধি গ্রহণ করার পথে ভারতীয়দের কোন আইনগত বাধা নেই। এই ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ভারতের সার্বভৌম প্রকৃতি-বিরোধী বলে অনেকে মনে করেন।

*উপসংহার*

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধানে ঘোষিত সাম্যের অধিকারকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে একটি সুদৃঢ় পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাস্তবে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসাম্য-বৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়ে গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা বালির ওপর সৌধ নির্মাণের মতোই হাস্যকর হয়ে দাঁড়ায়।

## • [২] স্বাধীনতার অধিকার (Right to Freedom)

স্বাধীনতার অধিকার একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ১৯-২২ নং ধারাগুলিতে স্বাধীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

সংবিধানের ১৯(১) নং ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের ছ' প্রকার স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করা হয়েছে, যথা—

*১৯ নং ধারায় বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারসমূহ*

[ক] বাক্-স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের অধিকার ;

[খ] শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্রভাবে সমবেত হওয়ার অধিকার ;

[গ] সংঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার ;

[ঘ] ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার ;

[ঙ] ভারতের যে-কোন অঞ্চলে স্বাধীনভাবে বসবাস করার অধিকার ; এবং

[চ] যে-কোন বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার।

মূল সংবিধানে 'সম্পত্তি দখল, অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার' অন্যতম স্বাধীনতার অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করলেও ১৯৭৮ সালে ৪৪-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের সাহায্যে এই অধিকারটিকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার ফলে বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার মৌলিক অধিকারের কৌলীন্য হারিয়ে বিধিবদ্ধ আইনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফলে, ভারতীয় নাগরিকরা বর্তমানে ছ'প্রকার স্বাধীনতার অধিকার ভোগ করতে পারে।

কোন আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকরা কখনই সীমাহীন বা নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না। কারণ, অবাধ স্বাধীনতার অর্থই হোল স্বেচ্ছাচারিতা, যা সমাজের অকল্যাণ ডেকে আনে। ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানে পূর্ব-বর্ণিত স্বাধীনতার অধিকারগুলির কোনটিই নিরঙ্কুশ নয়। এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায় এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) মন্তব্য করেছিলেন, চরম ও অনিয়ন্ত্রিত (absolute and uncontrolled) স্বাধীনতা বলে কোন কিছু হতে পারে না, কারণ, এরূপ স্বাধীনতা নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা (anarchy and disorder) সৃষ্টি করে। তাই রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে এগুলির ওপর যাতে 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' (reasonable restrictions) আরোপ করতে পারে, তার ব্যবস্থা ভারতীয় সংবিধানে করা হয়েছে। এখানে 'রাষ্ট্র' (the State) বলতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-আইনসভাগুলি ছাড়াও পৌরসভা (Municipality), ইউনিয়ন বোর্ড (Union Board) ইত্যাদির মতো স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষকে বোঝায়।

*স্বাধীনতার অধিকারগুলি সীমাহীন নয়*

✦ [ক] বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা (freedom of speech and expression)-র স্বীকৃতি গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত বলে বিবেচিত হয়। অন্যান্য উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো ভারতেও নাগরিদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে। এখানে প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা, বিবেক-বুদ্ধি ও রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসারে মতামত প্রকাশ করতে পারে। এই মতামত লিখিত বা মৌখিকভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। চিঠিপত্র, পত্র-পত্রিকা, পুস্তক-পুস্তিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার অধিকারী। আবার, সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা, বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমেও মতামত গঠিত ও প্রকাশিত হতে পারে। সরকারী কাজকর্মের ভুল-ত্রুটির সমালোচনা করে সরকারকে সংযত থাকতে বাধ্য করার ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের যেমন

*বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা*

Scanned with CamScanner

পৃথকভাবে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে, ভারতীয় সংবিধানে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। তবে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকারকে মতামত প্রকাশের অধিকারের অঙ্গীভূত বলে মনে করা হয়। গণ-পরিষদে এ নিয়ে বিতর্কের সময় ড. আম্বেদকর বলেছিলেন, কোনও সংবাদপত্রের সম্পাদক অথবা ম্যানেজার যেহেতু ভারতের নাগরিক, সেহেতু তাঁরা সাধারণ নাগরিকের মতোই অধিকারসমূহ ভোগ করতে পারেন। ভারতে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে তাঁরা সংবাদপত্রে নিজেদের মতামত প্রকাশ করার অধিকারী। তাই সংবিধানে স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার লিপিবদ্ধ করা অপ্রয়োজনীয়। রমেশ থাপ্পার বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় (১৯৫০) সুপ্রীম কোর্টের প্রদত্ত রায়ে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাকে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের অঙ্গীভূত বলে বর্ণনা করা হয়।

*বাধানিষেধসমূহ*

ভারতীয় সংবিধান নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর কতকগুলি যুক্তি-সঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করেছে। এগুলি হোল : **[i]** ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি (the sovereignty and integrity of India) রক্ষা ; **[ii]** রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা ; **[iii]** বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন সংরক্ষণ ; **[iv]** দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ; **[v]** শ্লীলতা বা সদাচার (decency or morality) রক্ষা ; **[vi]** আদালত-অবমাননা প্রতিরোধ ; **[vii]** মানহানি প্রতিরোধ প্রভৃতি এবং **[viii]** অপরাধমূলক কার্যে প্ররোচনাদান বন্ধ করার উদ্দেশে রাষ্ট্র সাধারণ অবস্থায়ও প্রয়োজনে বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ বা খর্ব করতে পারে [১৯(২) নং ধারা]।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৫০ সালে রমেশ থাপ্পার এবং ব্রিজভূষণ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট রায়দান করেন যে, সংবাদপত্র প্রকাশের পূর্বে সেন্সর-ব্যবস্থা কার্যকর করার অর্থ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা এবং কেবল জনশৃঙ্খলা (public order) বা জননিরাপত্তা (public safety)-র অজুহাতে রাষ্ট্র নাগরিকদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। সুপ্রীম কোর্টের এই রায়কে অকার্যকর করার জন্য ১৯৫১ সালে সংবিধানের প্রথম সংশোধনী আইন পাস করে কেবল 'ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি' রক্ষা-সংক্রান্ত বাধানিষেধ ছাড়া অন্যান্য বাধানিষেধ সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর ১৯৬৩ সালে ষোড়শ সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে 'ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি' রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্র নাগরিকদের বাক্ ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে বলে ঘোষণা করা হয়।

*সমবেত হওয়ার অধিকার ও তার নিয়ন্ত্রণ*

✦ **[খ]** ভারতীয় নাগরিকদের সমবেত হওয়ার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃতিলাভ করেছে। জনস্বার্থ সম্পর্কিত কোন বিষয় আলাপ-আলোচনার জন্য জনসমাবেশে সমবেত হওয়ার এবং শোভাযাত্রা করার অধিকার নাগরিকদের আছে। কিন্তু এই অধিকার ৫টি শর্তাধীনে ভোগ করা যেতে পারে। এগুলি হোল : **[i]** সভা-সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে, **[ii]** নাগরিকরা নিরস্ত্রভাবে সভা-সমাবেশে সমবেত হতে পারবে, এবং **[iii]** জনশৃঙ্খলার প্রয়োজনে (in the interests of public order) রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে [১৯(৩) নং ধারা]। ১৯৬৩ সালের ষোড়শ সংবিধান সংশোধনী আইনবলে রাষ্ট্র **[iv]** ভারতের সার্বভৌমিকতা রক্ষা এবং **[v]** সংহতি সংরক্ষণের প্রয়োজনে নাগরিকদের এই অধিকারের ওপর 'যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ' আরোপ করতে সক্ষম।

Scanned with CamScanner

✦ [গ] ভারতীয় নাগরিকদের সঙ্ঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার আছে। শ্রমিক সঙ্ঘ, ক্রীড়া সঙ্ঘ, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-বিষয়ক সঙ্ঘ বা সমিতি, রাজনৈতিক দল প্রভৃতি গঠন করা এই অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নাগরিকদের এই অধিকার নিরঙ্কুশ বা অবাধ নয়। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী, নীতি-বিগর্হিত উদ্দেশে গঠিত কিংবা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিঘ্নকারী সঙ্ঘ বা সমিতিগুলির ওপর রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে। তাছাড়া, ভারতের সার্বভৌমিকতা ও সংহতি রক্ষার প্রয়োজনেও এই অধিকারটিকে সরকার সংকোচন করতে সক্ষম [১৯(৪) নং ধারা]। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের হাতে অর্পিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৪২-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কার্যকলাপ বা জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী সংগঠনসমূহকে নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছিল [৩১(ঘ) নং ধারা]। এরূপ আইন সাম্যের অধিকার (১৪ নং ধারা), স্বাধীনতার অধিকার (১৯ নং ধারা) এবং সম্পত্তির অধিকার (৩১ নং ধারা) ক্ষুণ্ণ করলেও তাকে আদালত বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারবেন না। কিন্তু মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বাধীন জনতা সরকার ১৯৭৮ সালে ৪৩-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা রহিত করে পূর্বাবস্থা বহাল রাখার যে-ব্যবস্থা করেছিল, তা অদ্যাবধি বর্তমান রয়েছে।

*সঙ্ঘ ও সমিতি গঠনের অধিকার এবং তার নিয়ন্ত্রণ*

✦ [ঘ] ও [ঙ] ভারতের সর্বত্র স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার এবং যে-কোন অঞ্চলে বসবাস করার অধিকার প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কিন্তু, [i] জনস্বার্থে (in the interest of the general public) এবং [ii] তফসিলভুক্ত উপজাতিগুলির স্বার্থ-সংরক্ষণের উদ্দেশে রাষ্ট্র এই দু'টি অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে সক্ষম। এ বিষয়ে খারে বনাম দিল্লী রাজ্য মামলায় (১৯৫০) সুপ্রীম কোর্টের রায়ের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দিল্লী রাজ্য-সরকার হিন্দু মহাসভার তদানীন্তন সভাপতি এন. বি. খারেকে দিল্লী থেকে বহিষ্কার করার আদেশ দিলে খারে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু মামলায় সরকার পক্ষ স্বীয় কার্যের সমর্থনে এই যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, দিল্লীতে খারে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় দু'টির মধ্যে সম্প্রীতি বিনষ্ট করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু খারের কৌঁশুলী বলেন যে, ভারতীয় নাগরিক হিসেবে খারের যে-কোন স্থানে চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে। দিল্লী সরকার এই অধিকারে হস্তক্ষেপ ক'রে যে-নির্দেশ জারি করেছে, তা সংবিধান-বিরোধী। কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট জন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে দিল্লী সরকারের কাজকে সংবিধানগতভাবে যথার্থ বলে অভিমত পোষণ করেন এবং খারের আবেদন বাতিল করে দেন।

*যাতায়াত ও বসবাস করার অধিকার এবং সেগুলির নিয়ন্ত্রণ*

✦ [চ] ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতের প্রতিটি নাগরিক যে-কোন বৃত্তি, পেশা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকারী। কিন্তু জনস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে রাষ্ট্র এই অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে। বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে কর্মীদের যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চিকিৎসা, শিক্ষকতা ইত্যাদি বৃত্তির ক্ষেত্রে যেমন কতকগুলি গুণ বা যোগ্যতার প্রয়োজন, তেমনি বিশেষ বিশেষ কতকগুলি বৃত্তির জন্য প্রযুক্তিগত গুণাবলী (technical qualifications)-র প্রয়োজন। তাছাড়া, রাষ্ট্র জনস্বার্থে যে-কোন ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে নিজে কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত কোনও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিচালনা করতে পারে [১৯(৬) নং ধারা]।

*বৃত্তি বা পেশা গ্রহণের অধিকার ও তার সীমাবদ্ধতা*

Scanned with CamScanner

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, সংবিধানের ১৯(১) নং ধারাটি একদিকে যেমন নাগরিকদের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার অধিকার প্রদান করেছে, অন্যদিকে তেমনি ১৯ নং ধারার (২)-(৬) নং উপধারাগুলি অধিকারসমূহের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যবস্থা করেছে। এইভাবে ভারতীয় সংবিধান ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে।

*স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণে আদালতের ভূমিকা*

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার রায়দানকালে বিচারপতি মুখোপাধ্যায় বলেন, চরম বা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা বলে কিছুই হতে পারে না। কারণ, এরূপ স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত দেশের মধ্যে নৈরাজ্য এবং বিশৃঙ্খলা ডেকে আনে। দেশের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, জন-শৃঙ্খলা, সমাজের নীতিবোধ প্রভৃতির শর্তসাপেক্ষ অধিকার নাগরিকরা ভোগ করতে পারে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এবং সমাজের পরস্পর-বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন করার (adjusting the conflicting interests of the individual and the society) প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সাধারণভাবে প্রত্যেকে তার নিজের জীবনকে খুশিমত পরিচালনা করার স্বাধীনতা ভোগ করে অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি কোথায় যাবে, কোথায় বসবাস করবে, কোন্ বৃত্তি বা ব্যবস্থা গ্রহণ করবে ইত্যাদি বিষয় নির্বাচনে স্বাধীনতা ভোগ করে। অন্যদিকে, প্রত্যেকে যাতে নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে, সেজন্য ঐসব স্বাধীনতার ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষমতা সমাজের হাতে অবশ্যই থাকতে হবে। ভারতের সংবিধান ব্যক্তি-স্বাধীনতা (individual liberty) এবং সামাজিক নিরাপত্তা (social security)-র মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছে।

সংবিধানের ১৯ নং ধারাটি ব্যক্তি-স্বাধীনতার একটি তালিকা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন উপধারায় [১৯(২)-(৬) নং] ঐসব স্বাধীনতার ওপর আইন কর্তৃক এমন কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপের ব্যবস্থা করেছে, যেগুলি জনকল্যাণ (public welfare) অথবা জননৈতিকতা (public morality)-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ৩৯(খ) ও (গ) নং ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতিকে কার্যকর করতে গিয়ে কোন আইন প্রণীত হলে এবং সেই আইন ১৪ নং ও ১৯ নং ধারার পরিপন্থী হলেও তা বাতিল হবে না বলে ২৫-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয়েছিল। কেশবানন্দ ভারতী কিংবা মিনার্ভা মিলস্ মামলায় সুপ্রীম কোর্ট ২৫-তম ও ৪২-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাতিল করে দিলেও পূর্বোক্ত অংশটি বাতিল বলে ঘোষণা করেনি। ফলে অদ্যাবধি ১৪ নং ও ১৯ নং ধারার ওপর ৩৯(খ) ও (গ)-এর প্রাধান্য অর্থাৎ সাম্যের অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারের ওপর ৩৯(খ) ও (গ) ধারায় বর্ণিত নির্দেশমূলক নীতির প্রাধান্য পূর্বের মতোই থেকে গেছে। তাছাড়া, ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে ৫৯-তম সংবিধান সংশোধনী আইনে বলা হয় যে, যুদ্ধ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের মতো আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কিংবা সশস্ত্র বিদ্রোহের কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ১৯ নং ধারা স্থগিত থাকবে অর্থাৎ জরুরী অবস্থার সময় নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকার ভঙ্গ করা হলেও আদালতের কাছে বিচার প্রার্থনা করা যাবে না।

তবে স্বাধীনতার ওপর আইন কর্তৃক আরোপিত বাধানিষেধগুলি যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে। কোনও আইন যুক্তিসঙ্গতভাবে বাধানিষেধ আরোপ করেনি বলে মনে করলে আদালত সংশ্লিষ্ট আইন বা তার যে-কোন অংশকে সংবিধান-বিরোধী বলে বাতিল করে দিতে পারেন। ভারতের সুপ্রীম কোর্টের মতে, একটি বাধানিষেধ তখনই

Scanned with CamScanner

'যুক্তিসঙ্গত' বলে বিবেচিত হবে, যখন তা ব্যক্তিগত অধিকার এবং সমাজের অধিকারের মধ্যে যথার্থ সামঞ্জস্য বা ভারসাম্য (proper balance) রক্ষা করতে সক্ষম হবে। কোনও আইন 'খামখেয়ালীভাবে কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে' (arbitrarily or excessively) বাধানিষেধ আরোপ করলে তাকে 'যুক্তিসঙ্গত' বলা যায় না। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, যুক্তিসঙ্গত বলে বিবেচিত হওয়ার জন্য যে-কোন বাধানিষেধকে কেবল যথোচিত হলেই চলবে না, সেইসঙ্গে বাধানিষেধ আরোপের পদ্ধতিকে ন্যায়সঙ্গত এবং যথার্থ (fair and just) হতে হবে বলে দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন।

*স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণে আদালতের ভূমিকা*

ভারতীয় নাগরিকদের স্বাধীনতার অধিকার যথার্থভাবে সংরক্ষণের জন্য সংবিধানে আরও কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। *প্রথমতঃ,* ২০(১) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রচলিত আইনভঙ্গের অপরাধ ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং প্রচলিত আইনভঙ্গের জন্য প্রচলিত আইন অনুসারেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। অন্যভাবে বলা যায়, যে-অবস্থায় এবং যে-সময়ে কোন কাজ অপরাধজনক বলে ঘোষণা করা হয়, সেই সময়ের প্রচলিত আইন অনুসারে অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত থাকার জন্য সেই অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করা হবে। কোনও নতুন আইন প্রণয়ন করে পূর্বে সম্পাদিত অপরাধের বিচার করা যায় না। *দ্বিতীয়তঃ,* একই অপরাধের জন্য এক ব্যক্তিকে একাধিকবার শাস্তি প্রদান করা যাবে না [২০(২) নং ধারা]। এখানে 'শাস্তিপ্রদান' বলতে আইনভঙ্গের অপরাধে বিচার বিভাগ কর্তৃক শাস্তিবিধানের কথা বলা হয়েছে। কোন আইন যদি একই অপরাধের জন্য একাধিকবার শাস্তির ব্যবস্থা করে, তাহলে সেই আইন সংবিধান-বিরোধী বলে বাতিল হয়ে যাবে। তবে কোনও সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারী আদালতে একবার শাস্তি পাওয়ার পরও যদি তার কর্মস্থলে কর্তৃপক্ষের দ্বারা দ্বিতীয়বার শাস্তি লাভ করে, সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাজ সংবিধান-বিরোধী বলে বিবেচিত হবে না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, কোনও সরকারী ব্যাঙ্ক কিংবা বেসরকারী কোম্পানীর কোষাধ্যক্ষ (cashier) তহবিল তছরূপের দায়ে আদালত কর্তৃক দণ্ডিত হওয়ার পরেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে পারে। *তৃতীয়তঃ,* অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে নিজের বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যায় না [২০(৩) নং ধারা]।

*দোষী সাব্যস্ত করা ও শাস্তি দেওয়া সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি*

সংবিধানের ২১ নং ধারায় বলা হয়েছে, 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (procedure established by law) ছাড়া অন্য কোন উপায়ে কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (life or personal liberty) থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এর অর্থ হোল— বেআইনীভাবে শাসন বিভাগ ভারতীয় নাগরিকের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত আইনের সমর্থন লাভ করলেই কেবল শাসন বিভাগ নাগরিকদের জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে সংবিধানের ২১ নং ধারাটি শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারী (arbitrary) বা বেআইনী (illegal) কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যক্তিকে রক্ষা করলেও এই ধারা আইন বিভাগের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ বলে বিবেচিত হয় না বলে দুর্গাদাস বসু অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে প্রণীত ৫৯-তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে। এই সংশোধন অনুসারে পাঞ্জাব বা তার

*জীবন ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকার*

Scanned with CamScanner

কোন অংশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে অন্যান্য মৌলিক অধিকারের মতো ২১ নং ধারায় ঘোষিত অধিকারগুলিও অকার্যকর হয়ে পড়বে। কিন্তু ৬৩-তম সংবিধান সংশোধনের (১৯৮৯) মাধ্যমে ৫৯-তম সংবিধান সংশোধনী আইনটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উন্নিকৃষ্ণাণ বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় (১৯৯৩) প্রদত্ত রায়ে সুপ্রীম কোর্ট শিক্ষার অধিকারকে জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই রায়দানের পর ১৯৯৮ সালে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশে রাজ্যসভায় ৮৩-তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করেন। ঐ বিলে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্কদের শিক্ষালাভের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য ২১-ক নং একটি উপধারা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করার কথা বলা হয়। অনেক টালবাহানার পর বি. জে. পি.-সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৯৩-তম সংবিধান সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করে এবং ২০০২ সালে তা ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনী আইন হিসেবে গৃহীত হলে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা লাভ করে।

২১ নং ধারায় বর্ণিত 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' এবং 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'-র অর্থ ও প্রকৃতি নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে এবং অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোনও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। লক্ষণীয় বিষয় হোল—'মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত উপ-কমিটি' (the Sub-committee on Fundamental Rights) খসড়া কমিটি (Drafting Committee)-র কাছে যে-রিপোর্ট পেশ করে, তাতে কেবল 'স্বাধীনতা' কথাটির উল্লেখ ছিল। কিন্তু বি. এন. রাউ-এর পরামর্শক্রমে খসড়া কমিটি 'স্বাধীনতা' শব্দটির পূর্বে 'ব্যক্তিগত' (personal) বিশেষণটি সংযোজন করে। তবে গণ-পরিষদ বা সংবিধান কোথাও 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা' বলতে কী বোঝায় কিংবা এর প্রকৃতি কী, তা ব্যাখ্যা করেনি। 'ব্যক্তিগত স্বাধীনতা'কে ব্যাপক এবং সংকীর্ণ—উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ইংরেজ বিচারপতি লর্ড আলফ্রেড ডেনিং (Lord Alfred Denning)-এর মতে, "অন্য কারও দ্বারা সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা-মুক্ত হয়ে প্রতিটি আইনমান্যকারী নাগরিক (every law-abiding citizen)-এর স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার এবং যে-কোন বৈধ স্থানে যাতায়াত করার অধিকারকে আমি ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলে মনে করি।" কিন্তু ভারতের সুপ্রীম কোর্ট প্রথমদিকে এই ব্যাপক অর্থে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কথাটি গ্রহণ করেননি। উদাহরণ হিসেবে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলার (১৯৫০) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মামলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি (কেনিয়া, শাস্ত্রী, দাস ও মুখোপাধ্যায়) সংবিধানের ১৯(১)(ঘ) ধারাটিকে ২১ নং ধারা থেকে পৃথকভাবে প্রয়োগ করার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তাঁদের মতে, ভারতের যে-কোন স্থানে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করার অধিকারকে ২১ নং ধারায় বর্ণিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকারের অধীন রেখে বিচার-বিবেচনা করা যাবে না। কিন্তু বিচারপতি ফজল আলি ভিন্ন মত ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে, আইনগত দিক থেকে বিচার করে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং যে-কোন স্থানে যাতায়াত করার স্বাধীনতাকে অভিন্ন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। তাই তিনি যে-কোন স্থানে যাতায়াত করার স্বাধীনতাকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করে একে অন্যতম 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' বলে অভিমত প্রকাশ করেন। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত বিচারপতি আলির অভিমত প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি।

*ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ ও প্রকৃতি*

পরবর্তী সময়ে সুপ্রীম কোর্ট কিছুটা ব্যাপক অর্থে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' কথাটিকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। খড়্গ সিং বনাম ইউ. পি. রাজ্য (১৯৬৪), সতওয়ান্ত সিং বনাম ডি. রামরথ্নম্

Scanned with CamScanner

(১৯৬৭) প্রভৃতি মামলায় সুপ্রীম কোর্ট পূর্ব-বর্ণিত গোপালন মামলায় প্রদত্ত রায় অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক অর্থে ব্যক্তি-স্বাধীনতা কথাটি প্রয়োগ করার পক্ষে অভিমত দেন। ১৯৭৮ সালে মানেকা গান্ধী বনাম ভারত ইউনিয়ন মামলায় রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্ট বলেন যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার ১৯ নং ধারায় বর্ণিত অধিকারগুলির সঙ্গে সম্পর্কহীন নয় ; বরং একটি অন্যটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের ক্ষেত্রে আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতির যৌক্তিকতা (reasonableness) বিচারের ক্ষমতা আদালতের রয়েছে।

*সুপ্রীম কোর্ট ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা*

ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারায় 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (procedure established by law) ছাড়া কোনও ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করা যাবে না বলে বলা হয়েছে। কিন্তু 'মৌলিক অধিকার-সংক্রান্ত উপ-কমিটি' (the Sub-Committee on Fundamental Rights)-র খসড়া রিপোর্টের ১১ নং উপধারায় (clause) বলা হয়েছিল যে, 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' (due process of law) ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা কিংবা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। কিন্তু এই উপ-কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্টে বিষয়টিকে ১২ নং উপধারায় স্থান দেওয়া হয়। তবে উপদেষ্টা কমিটি (the Advisory Committee) উপরি-উক্ত কথাগুলির মধ্য থেকে 'সম্পত্তি' কথাটিকে বাদ দেয়। এরপর সংবিধানের খসড়া কমিটি (the Drafting Committee) প্রধানতঃ বি. এন. রাউ-এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'-র পরিবর্তে 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' (procedure established by law) কথাগুলিকে সংবিধানের ২১ নং ধারায় লিপিবদ্ধ করেন। এইভাবে ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি'র দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে জাপানী সংবিধানের ৩১ নং ধারার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র ব্যবস্থাকে সংবিধানে স্থান দেন।

*আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি নিয়ে মতবিরোধ*

প্রশ্ন হোল—'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' এবং 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র মধ্যে পার্থক্য কি? 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসারে বিচারকার্য সম্পাদন করতে গিয়ে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট কেবল আইনটি যথাযথ পদ্ধতি অনুসারে প্রণীত হয়েছে কিনা তা-ই বিচার করেন না, সেই সঙ্গে আইনটি 'স্বাভাবিক ন্যায়নীতি-বোধ' (principle of natural justice)-এর বিরোধী কিনা তা-ও বিচার করেন। অন্যভাবে বলা যায়, কোনও আইন ন্যায়সঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, সব নীলচক্ষুবিশিষ্ট শিশুকে হত্যা করা হবে বলে কংগ্রেস কোন আইন প্রণয়ন করলে পদ্ধতিগতভাবে সেই আইন সঠিকভাবে প্রণীত হলেও ন্যায়নীতিবোধের বিরোধী বলে মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারেন।

*আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির অর্থ ও প্রকৃতি*

কিন্তু 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' অনুসারে আদালত কোনও আইনের গুণাগুণ অর্থাৎ কোনও আইন ন্যায়নীতিবোধের বিরোধী কিনা তা বিচার করতে পারেন না। 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' বলতে বোঝায়—যে-আইন অনুসারে ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে, সেই আইনটি বৈধ আইনসভা কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে প্রণীত কিনা তা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের থাকবে। আদালত এই আইনের যৌক্তিকতা বিচার করার অধিকারী নয়। ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারায় বর্ণিত 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ. কে. গোপালন বনাম মাদ্রাজ রাজ্য মামলায় সুপ্রীম কোর্ট

*আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতির অর্থ ও প্রকৃতি*

Scanned with CamScanner

সংকীর্ণ অর্থে কথাগুলি প্রয়োগ করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। এই মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতি বলেন, সংবিধানের ২১ নং ধারায় 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি' কথাগুলি লিপিবদ্ধ করে আমাদের সংবিধান ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনের 'যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসরণের পরিবর্তে 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণাকেই গ্রহণ করেছে। অন্যভাবে বলা যায়, ভারতীয় সংবিধান আইন বিভাগের ওপর কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করলেও বিচার বিভাগের প্রাধান্যের পরিবর্তে পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতাকেই স্বীকার করে নিয়েছে। এইভাবে, ভারতে কোন ব্যক্তির জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে কিনা তা কেবল আইন-নিদিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে দেখার ক্ষমতা আদালতের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। আইন কিংবা আইনগত পদ্ধতির যৌক্তিকতা বা গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আদালতের নেই বলে এ. কে. গোপালন মামলায় সুপ্রীম কোর্ট অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু মানেকা গান্ধী মামলায় (১৯৭৮) সুপ্রীম কোর্ট এতখানি সংকীর্ণ অর্থে 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র ধারণাটিকে গ্রহণ করতে সম্মত হননি। এই মামলার রায়ে সুপ্রীম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, 'আইন-নির্দিষ্ট পদ্ধতি'র যৌক্তিকতা বিচার করার ক্ষমতা আদালতের রয়েছে।

২০০২ সালে ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের মধ্যে ২১-ক নং ধারাটি সংযোজিত হয়। এই ধারায় শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্র ৬-১৪ বছর বয়স্ক প্রতিটি শিশুর জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা (free and compulsory)-র ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উন্নিকৃষ্ণান বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য মামলায় (১৯৯৩) প্রদত্ত রায়ে সুপ্রীম কোর্ট শিক্ষার অধিকারকে জীবনের অধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এই রায়দানের পর ১৯৯৮ সালে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্ট সরকার শিক্ষার অধিকারকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশে রাজ্যসভায় ৮৩-তম সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করেছিলেন। ঐ বিলে ৬-১৪ বছর বয়স্কদের শিক্ষালাভের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতিদানের জন্য ২১-ক নং একটি ধারা সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করার কথা বলা হয়। অনেক টালবাহানার পর বি.জে.পি.-র নেতৃত্বাধীন জোট সরকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৯৩-তম সংবিধান সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে উত্থাপন করেন এবং ২০০২ সালে তা ৮৬-তম সংবিধান সংশোধনী আইন হিসেবে গৃহীত হলে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের মর্যাদা লাভ করে।

*শিক্ষার অধিকার*

ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং ধারায় গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, **[i]** কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও আটক করা হলে যথাসম্ভব সত্বর তাকে গ্রেপ্তার ও আটক করার কারণ জানাতে হবে। **[ii]** আটক ব্যক্তিকে উকিলের মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না [২২(১) নং ধারা]। **[iii]** গ্রেপ্তার করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই আটক ব্যক্তিকে নিকটবর্তী আদালতে উপস্থিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আদালতের অনুমতি ছাড়া তাকে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনভাবেই আটক রাখা যাবে না [২২(২) নং ধারা]। কিন্তু [ক] শত্রুভাবাপন্ন বিদেশী (enemy alien) এবং [খ] নিবর্তনমূলক আটক (preventive detention) আইনে ধৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এইসব নিয়ম প্রযোজ্য হবে না [২২(৩) নং ধারা]।

*গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি*

'নিবর্তনমূলক আটক' বলতে বোঝায়—কোন ব্যক্তি অপরাধমূলক কার্যে জড়িত রয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে অপরাধ করতে পারে বলে আশঙ্কা করে সরকার সেই ব্যক্তিকে বিনা বিচারে

Scanned with CamScanner

আটক করতে পারে। নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে সরকারকে গ্রেপ্তার বা আটকের কারণ দর্শাতে কিংবা আদালতের সামনে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থিত করতে হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, যখন

*নিবর্তনমূলক আটকের অর্থ ও প্রকৃতি*

কোন ব্যক্তি অপরাধমূলক কার্যে লিপ্ত আছে কিংবা অপরাধ করতে পারে বলে সন্দেহ করা সত্ত্বেও সরকার তার বিরুদ্ধে উপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, তখন সেই ব্যক্তিকে ভবিষ্যতে অপরাধমূলক কার্য থেকে বিরত করার জন্য সন্দেহবশে গ্রেপ্তার বা আটক করাকে 'নিবর্তনমূলক আটক' বলা হয় বলে দুর্গাদাস বসু মন্তব্য করেছেন। ভারতের প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় (foreign affairs), দেশের অথবা কোন অঙ্গরাজ্যের নিরাপত্তা, জন-শৃঙ্খলা, অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর সরবরাহ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা প্রভৃতি উদ্দেশে পার্লামেন্ট এবং রাজ্য-আইনসভাগুলি নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রণয়ন করতে পারে। সংবিধানের ২২(৪)—(৭) নং উপধারাগুলি অনুসারে নিবর্তনমূলক আটক আইনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ৩ মাসের বেশি আটক রাখা যাবে না। এই সময়ের বেশি আটক রাখতে হলে হাইকোর্টের কর্মরত কিংবা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অথবা অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন একাধিক ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত একটি উপদেষ্টা পর্ষদ (an Advisory Board)-এর অনুমতি প্রয়োজন। এরূপ আটকের সর্বাধিক মেয়াদ কী হবে, তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের রয়েছে [২২(৭) নং ধারা]।

সরকারী কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে যাতে নিবর্তনমূলক আটক আইন প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য সংবিধানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ২২(৫) নং ধারায় বলা হয়েছে যে, আটকাদেশ

*আটকের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক ব্যবস্থা*

প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে যথাসম্ভব সত্বর আটক ব্যক্তিকে আটকের কারণ জানাতে হবে এবং আটকের বিরুদ্ধে আদালতে আবেদন করার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি আটক করার পশ্চাতে যেসব তথ্য (facts) আছে, সেগুলিকে 'জনস্বার্থ' (public interest)-এর প্রয়োজনে প্রকাশ করা অনুচিত বলে মনে করে, তাহলে সেই কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিকে সেগুলি জানাতে বাধ্য নয় [২২(৬) নং ধারা]।

সুতরাং বলা যায়, সংবিধানে ২২(৫) নং ধারাবলে নিবর্তনমূলক আটক আইনের দ্বারা কোনও ব্যক্তিকে আটক করা হলে সে সংবিধানের ৩২ নং এবং ২২৬ নং ধারায় বর্ণিত 'বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ'

*নিবর্তনমূলক আটকের ক্ষেত্রে আদালতের ভূমিকা*

*(habeas corpus)*-এর দাবিতে যথাক্রমে সুপ্রীম কোর্ট এবং হাইকোর্টের নিকট আবেদন করতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে আদালত কয়েকটি বিষয় বিচার-বিবেচনা করে দেখতে পারে, যেমন—**[i]** যে-আইন অনুসারে আটক করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আদালত সেই আইনের বৈধতা (validity) বিচার করতে পারেন। **[ii]** আইন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আটক করা হয়েছে কিনা তা আদালত দেখতে পারেন। **[iii]** আটককারী কর্তৃপক্ষ কোনও ব্যক্তিকে আটক করার যেসব কারণ প্রদর্শন করেছে, সেগুলি যথাযথ এবং স্পষ্ট কিনা তা আদালত বিচার করার অধিকারী। **[iv]** যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে আটককারী কর্তৃপক্ষ আটক ব্যক্তিকে প্রাথমিক (initial) অথবা অনুপূরক (supplementary) কারণ দেখিয়েছেন কিনা তা আদালত বিচার করতে পারেন। **[v]** আটককারী কর্তৃপক্ষের আটক করার প্রকৃত ক্ষমতা *(bonafide)* আছে কিনা আদালত তা বিচার-বিবেচনা করে দেখার অধিকারী। উপরি-উক্ত বিষয়গুলি বিচার-বিবেচনা করে আদালত সন্তুষ্ট হতে না পারলে আটক ব্যক্তিকে মুক্ত করে দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।

Scanned with CamScanner

তেলেঙ্গানার কৃষক-আন্দোলনের সময় কমিউনিস্টদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রস্তাব অনুসারে ১৯৫০ সালে সর্বপ্রথম পার্লামেন্ট 'নিবর্তনমূলক আটক আইন' (Preventive Detention Act, 1950) প্রণয়ন করেছিল। প্রথমে মাত্র ১ বছরের জন্য প্রণীত হলেও বারংবার মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৯৬৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আইনটি বলবৎ রাখা হয়। এরপর ১৯৭১ সালে 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইন' বা 'মিসা' (Maintenance of Internal Secutiry Act) নামে অন্য একটি আইন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার প্রণয়ন করে। প্রকৃতিগতভাবে এই আইনের সঙ্গে পূর্বোক্ত আইনের কোন পার্থক্য নেই। ১৯৭৪ সালে পার্লামেন্ট 'বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ও চোরাচালান প্রতিরোধ-সংক্রান্ত আইন' (Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974) প্রণয়ন করে। এই আইনটিকে সংক্ষেপে 'কোফেপোসা' (COFEPOSA) বলে অভিহিত করা হয়। এইভাবে 'মিসা' ও 'কোফেপোসা' আইন দু'টি একই সঙ্গে বলবৎ থাকে। কিন্তু ১৯৭৭ সালে মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বাধীন জনতা-সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে 'মিসা' বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জনতা-সরকারের পতনের পর ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (ই) দল পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়ে ১৯৮০ সালে 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' (National Security Act, 1980) পাস করেন। 'আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা আইনে'র সঙ্গে 'জাতীয় নিরাপত্তা আইনে'র পার্থক্য হোল—প্রথমোক্ত আইনে কোন ব্যক্তি তার আটকাদেশের বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে পারত না। কিন্তু শেষোক্ত আইনে আটক ব্যক্তির সেই অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, আটক ব্যক্তিকে ৫-১০ দিনের মধ্যে আটক করার কারণ জানাতে হবে এবং উপদেষ্টা পর্ষদের অনুমতি ছাড়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক রাখা যাবে না বলেও এই আইনে বলা হয়েছে। এই আইন অনুসারে সরকার কোন ব্যক্তিকে সর্বাধিক ১ বছর পর্যন্ত আটক রাখতে পারেন। তাছাড়া, ঐ বছরেই 'কালোবাজারী প্রতিরোধ ও অত্যাবশ্যক দ্রব্যসামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখা-সংক্রান্ত আইন' (Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act) প্রণীত হয়। এরপর ১৯৮১ সালে 'অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কাজকর্ম চালু রাখা-সংক্রান্ত আইন' (The Essential Services Maintenance Act, 1981) বা 'এসমা' (ESMA) নামক অনুরূপ একটি অগণতান্ত্রিক আইন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার পাস করেন। এই আইনে অত্যাবশ্যক সংস্থাসমূহে কেবল ধর্মঘট নিষিদ্ধই করা হয়নি; সেই সঙ্গে ধর্মঘটে প্ররোচনাদানকারী বলে সন্দেহভাজন যে-কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ও শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৪ সালের ৫ই এপ্রিল রাষ্ট্রপতি ১৯৮০ সালের জাতীয় নিরাপত্তা আইন (নাসা) সংশোধন করে একটি অর্ডিন্যান্স জারি করেন। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিনা বিচারে আটক রাখার মেয়াদ ১ বছর থেকে বাড়িয়ে ২ বছর করা হয়। তাছাড়া, উপদেষ্টা পর্ষদের মতামত ছাড়াই কোন ব্যক্তিকে ৬ মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখা যাবে। আটক করার কারণ জানানোর মেয়াদ জরুরী ক্ষেত্রে ৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ১০ দিন করা হয়। এরপর অর্ডিন্যান্সটিকে আইনে রূপ দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে নাসা সংশোধনী বিল আনীত হয়। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে বিরোধী দলের সদস্যরা বিলটির তীব্র সমালোচনা করলেও ১৯৮৪ সালের ২২শে আগস্ট তা গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভের পর তা আইনে রূপান্তরিত হয়। ১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে 'এসমা সংশোধনী আইন' পাস করা হয়। এই আইনে আরও ৫ বছরের জন্য 'এসমা' কার্যকর রাখার কথা বলা হয়েছিল। ১৯৯০ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর

*ভারতে বিভিন্ন ধরনের আটক আইন*

Scanned with CamScanner

'এসমা'র মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও তদানীন্তন চন্দ্রশেখর-সরকার পুনরায় তার মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

সাম্প্রতিককালে 'সন্ত্রাস দমন আইন' বা 'পোটা' (Prevention of Terrorist Act, 2002) প্রণীত হয়েছে। ইতঃপূর্বে জারি করা 'সন্ত্রাস দমন অর্ডিন্যান্স' বা 'পোটা' (Prevention of Terrorist Ordinance) ২০০২ সালের ১৮ই মার্চ লোকসভায় গৃহীত হলেও ২১শে মার্চ তা রাজ্যসভায় বাতিল হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত পার্লামেন্টের যৌথ অধিবেশনে গৃহীত হওয়ার পর সেটিকে রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত হলে 'পোটো' রূপান্তরিত হয় 'পোটা'তে। 'সন্ত্রাস দমন আইনে'র গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হোল : **[i]** মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে সংগঠিত অপরাধ 'সন্ত্রাস' বলে গণ্য হবে; **[ii]** যে-কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের জন্য সমর্থন চাওয়া, সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন ক'রে বক্তৃতা দেওয়া, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য বৈঠকের আয়োজন করা প্রভৃতি হোল 'অপরাধ'; **[iii]** যে-কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ও তাদের সদস্য ও সমর্থকদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে; **[iv]** সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত বলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ৩ মাস এবং বিশেষ আদালতের অনুমতিক্রমে আরও ৩ মাস কোন চার্জশিট ছাড়াই আটক রাখা যাবে; **[v]** নির্দিষ্ট কয়েকটি শর্ত মেনে একজন পুলিস অফিসারই অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতে পারবেন এবং আদালতে তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং **[vi]** সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে হস্তাক্ষর, আঙুলের ছাপ, পায়ের ছাপ, রক্ত, থুথু ইত্যাদির নমুনা দেওয়ার নির্দেশ জারির জন্য পুলিশ আদালতকে অনুরোধ করতে পারবে। তবে এইসব ক্ষেত্রে তদন্তের দায়িত্বে থাকবেন ডেপুটি পুলিশ সুপার বা তাঁর উর্ধ্বতন কোন পুলিশ অফিসার। আবার, স্বীকারোক্তি গ্রহণের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই একজন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট তা নথিভুক্ত করতে হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তার ওপর নির্যাতন করা হয়েছে কীনা, তা পরীক্ষা ক'রে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট একজন ডাক্তারকে নির্দেশ দিতে পারবেন। তাছাড়া, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জেরা করার সময় তার আইনজীবীকে আংশিকভাবে উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হবে। সর্বোপরি, ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারকে শাস্তি দেওয়ার বিধান সন্ত্রাস দমন আইনে রয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও আইনে বলা হয়েছে। এইসব রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যেতে পারে যে, সরকারী ক্ষমতায় আসীন দল বা মোর্চা বিরোধী দলকে শক্তিহীন বা ধ্বংস করার জন্য যে এই আইন প্রয়োগ করবে না—একথা কখনই হলফ ক'রে বলা যায় না।

*উপসংহার*

যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণ অবস্থায় 'নিবর্তনমূলক আটক' আইনের অবস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। ঐসব দেশে কেবল জরুরী অবস্থার সময় এই ধরনের আইন প্রণীত হয়। কিন্তু ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য যে, ভারতে সাধারণ অবস্থায়ও অর্থাৎ জরুরী অবস্থার সময় ছাড়া অন্য সময়েও এইসব অগণতান্ত্রিক আইন প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন সময় রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম কোর্টের মহামান্য বিচারপতিগণ 'নিবর্তনমূলক আটক' ব্যবস্থার অগণতান্ত্রিক প্রকৃতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিচারপতি পাতঞ্জলি শাস্ত্রী 'নিবর্তনমূলক আটক' ব্যবস্থাকে সংবিধানের 'অশুভ বৈশিষ্ট্য' (sinister-looking feature), 'ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ' (a serious invasion of personal liberty) ইত্যাদি বলে বর্ণনা করেছেন। পরিশেষে বিচারপতি মহাজনের ভাষায়

Scanned with CamScanner

আমরা মন্তব্য করতে পারি, 'নিবর্তনমূলক আটক আইনসমূহ গণতান্ত্রিক সংবিধানগুলির বিরোধী' (repugnant to democratic constitutions) এবং বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক দেশে তাদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে না।

Scanned with CamScanner